ফিরে দেখা ৫ম বর্ষ

বছর শেষে হিসাব হয়তো করতে বসলে ঘুরেফিরে বার বার নিজেদের কথা আলোচনায় চলে আসে। নিজেদের কাছে পুরোপুরি সৎ থেকে আমরা কাজ করেছি, করার চেষ্টা করিছি। কখনোই আপোষ করিনি। এই দাবি আমরা জোর দিয়েই করতে পারি। সারা বছর ধরে সাপ্তাহিক ২০০০ যে আলোচিত প্রতিবেদনগুলো প্রকাশ করেছে, সময়ে সময়ে সেগুলোর কিছু ফলোআপ ২০০০-এ ছাপাও হয়েছে। বাংলাদেশের মতো দেশে একটি চাঞ্চল্যকর সংবাদ শেষ হতে না হতেই জন্ম নেয় আরো একাধিক চালঞ্চল্যকর সংবাদ। পুরনো হারিয়ে যায় নতুনের ভীড়ে। তারপরও কিছু কিছু ঘটনা থেকে যায় মানুষের মনে। প্রতিবেদন প্রকাশের পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ জানতে চায় মানুষ। সেরকম কিছু ফলোআপ প্রতিবেদন হাজির করা হলো পাঠকের সামনে।

সাপ্তাহিক ২০০০-এর বছরের সবচেয়ে আলোচিত প্রতিবেদন ছিল **'তিন্নী হত্যা রহস্য : এক্স ফাইল অভি'**। পাঠকের নিশ্চয় মনে আছে অভির লোকজন বাজার থেকে ২০০০-এর ওই সংখ্যাটি সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করে, কিছুটা সফলও হয়। দৈনিক জনকণ্ঠে এটা নিয়ে একটি রিপোর্টও প্রকাশিত হয়। এই প্রতিবেদনটির ফলোআপ এখানে উল্লেখ করা হয়নি। কারণ আমরা এটা নিয়ে এখনো অনুসন্ধান করছি। গাজীপুরের জামালের কথাও হয়ত পাঠক ভুলে যাননি। যাকে পুলিশ ধরে এনে হত্যা করেছিল। সেই 'হত্যাকারী পুলিশ' প্রতিবেদনের ফলোআপ নিয়েও আমরা কাজ করছি। তাই এই প্রতিবেদন দু'টির ফলোআপ প্রকাশিত হলো এই সংখ্যায়।

আর এখানে রাজনৈতিক প্রতিবেদনগুলোর ফলোআপ ইচ্ছে করেই করা হয়নি। কারণ আমাদের ভন্ড রাজনীতিবিদদের চরিত্র কখনো বদলায় না। তাদের নিয়ে নতুন করে কিছু লেখারও নেই।

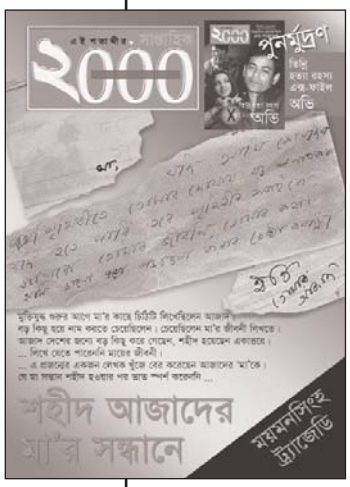

শহীদ আজাদের মায়ের সন্ধানে

সাপ্তাহিক ২০০০-এ প্রচ্ছদ কাহিনী ছাপানোর আগে-পরে

আনিসুল হক

শহীদ আজাদ আর তার মায়ের অবিশ্বাস্য করুণ কাহিনী নিয়ে আমি একটা উপন্যাস রচনার প্রয়াস পেয়েছিলাম, তার নাম 'মা'। মা-এর গল্পটা আমি কিভাবে পেলাম, তারপর ধীরে ধীরে কিভাবে একজন একজন করে মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করলাম, আর সবশেষে কিভাবে শহীদ আজাদের পরিবার-পরিজনের খোঁজ বের করলাম, সেই গল্পটাও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়েছিলো সাপ্তাহিক ২০০০ পরিকল্পকদের কাছে। দৈনিক প্রথম আলোর ঈদ সংখ্যায় মা উপন্যাস হিসেবে সংক্ষিপ্ত কলেবরে বেরুনোর পর সাপ্তাহিক ২০০০-এর নির্বাহী সম্পাদক আদনান আমার কাছে উপন্যাস 'মা' রচনার নেপথ্য কাহিনীটাই লিখে দেবার অনুরোধ জানান। আমি সানন্দে সম্মত হই। কারণ উপন্যাসে আমি শহীদ আজাদের ছবি, চিঠি ইত্যাদি জিনিসপত্র ব্যবহার করতে পারিনি। লোকে উপন্যাসের সঙ্গে দলিল-দস্তাবেজ দেখতে চায় না। কাজেই এই উপন্যাস রচনা করতে গিয়ে আমি যে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা করেছি, তা পাঠকদের জানানো ও আজদের ছবি, চিঠি ইত্যাদি প্রকাশ করার ব্যাপারে আমার নিজেরই আগ্রহ ছিলো পুরোদস্তুর। আমি একটা লেখা তৈরি করে সাপ্তাহিক ২০০০-এ জমা দেই। সাপ্তাহিক ২০০০-এর সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শাহাদত চৌধুরী পুরো লেখাটা পড়েন এবং স্বহস্তে সম্পাদনা করেন। আমি তার পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করার দক্ষতায় অভিভূত হই। অসাধারণ একটা ভূমিকা তিনি আমার লেখার শুরুতে যুক্ত করেন।

১৬ ডিসেম্বর ২০০২ সাপ্তাহিক ২০০০-এ লেখাটা প্রকাশিত হয়। প্রকাশের পর পাঠক যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন, তাতেও আমি খানিকটা মুগ্ধ আর খানিকটা বিস্মিত হই। দেশের নানা স্থান থেকে পাঠকেরা চিঠি লেখেন। ফোনও আসে দু-একটা। যারা ফোন করেন, তাদের অনেকেই মাতৃস্থানীয়। এক মহিলা কাঁদতে কাঁদতে আমাকে জিজ্ঞেস করেন, আমরা কি প্রয়োজনের সময় আজাদের মায়ের মতো এই আত্মত্যাগ করতে পারবো? আমরা কি পারবো নিজের ছেলেকে দেশের জন্যে উৎসর্গ করতে? আমি বলি, পারবেন। মানুষ সব সময় বীর থাকে না। বীর নিজেও সব সময় বীর নয়। প্রয়োজনের সময়ে সে অসীম ক্ষমতায় জেগে ওঠে। আমাদের কার ভেতরে কোন শক্তি আছে, সেটা এখন হয়তো বলা যাবে না। কিন্তু সময় তার প্রয়োজনে আমাদের দ্বারাও বড় কাজ করিয়ে নিতে পারে। এটা হলো সময়ের গুণ। ১৯৭১ এরকম একটা ম্যাজিক সময়, যখন সাধারণও অসাধারণ সৌন্দর্য ও বীরত্বে জেগে উঠেছিলো।

শহীদ আজাদের আত্মীয়স্বজনও এই লেখাটি পড়েন। তারা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আমি আমার উপন্যাসের জন্যে আরো তথ্য-উপাত্ত পেয়ে যাই। এভাবে সাপ্তাহিক ২০০০-এর কাজে লেগে আমি নিজেই নিজের উপকার করি।

আমি যেদিন মা-এর কাজ শুরু করি, প্রথম নাসিরউদ্দীন ইউসুফের বাড়ি যাই। সে দিনই ফেরার পথে আমি সাপ্তাহিক ২০০০-এর অফিসে গিয়েছিলাম ঢাকার গেরিলা অপারেশনের ওপরে প্রকাশিত লেখাসমৃদ্ধ পত্রিকা জোগাড়ের উদ্দেশ্যে। তারপর নানা পর্যায়ে সম্পাদক শাহাদত চৌধুরীর কাছে আমাকে যেতে হয়েছে তথ্যের জন্যে, সহযোগিতার জন্যে, বুদ্ধির জন্যে। আমার 'মা' লেখার অভিজ্ঞতার সঙ্গে সাপ্তাহিক ২০০০ এভাবে আগাগোড়াই জড়িয়ে আছে।

আমার মনে আছে, শহীদ আজাদের এক খালাতো বোন ২০০০-এর এই প্রচ্ছদ কাহিনীটা পড়ে নাসির উদ্দীন ইউসুফের ড্রিম ফ্যাক্টরি অফিসের খোঁজে পুরো সিদ্ধেশ্বরী চষে শেষে হাজির হয়েছিলেন আবদুন নূর তুষারের অফিসে। ভাগ্যিস তিনি তুষারের কাছেই গিয়েছিলেন। তুষার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে মোবাইলে ফোন করে তার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেন।

এ সবই 'মা' উপন্যাসে একটু একটু করে যোগ হয়েছে। এখনও হচ্ছে।

ধন্যবাদ, সাপ্তাহিক ২০০০।

দিনে ৬ লাখ টাকার চান্দা

বদরুদ্দোজা বাবু

গত বছর সাপ্তাহিক ২০০০-এর আলোচিত কয়েকটি প্রচ্ছদ কাহিনীর মধ্যে একটি ছিলো 'দিনে ৬ লাখ টাকার চান্দা' শিরোনামের প্রচ্ছদ কাহিনীটি। এই অনুসন্ধান প্রতিবেদনটির সাড়া ছিলো ব্যাপক। শীতলক্ষ্যা নদীতে হওয়া চাঁদাবাজিকে তুলে আনা হয় প্রতিবেদনে। নেপথ্যের ব্যক্তিদেরও পরিচয় পাওয়া যায়। প্রতিবদনটি প্রকাশ হবার পরে নারায়ণগঞ্জ, ডেমরা ও রূপগঞ্জ এলাকায় কিছুটা হলেও অবস্থার উন্নতি হয়। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বালুভর্তি ট্রলারগুলো এখন শীতলক্ষ্যায় চলে না। কারণ বালু ফেলার সাইটগুলো বন্ধ। ডেমরার পাশ দিয়ে যাওয়া ছোট চ্যানেলটি শীতকালে শুকিয়ে যায়। বর্ষায় ট্রলার চলার অনুপোযুক্ত হয়ে পড়ে চ্যানেলটি। বর্ষা মৌসুম আসছে। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে চাঁদাবাজরা পকেট স্ফীত করতে।

প্রতিবেদনে আমরা দেখিয়েছিলাম, শীতলক্ষ্যা নদীর ১২টি স্পটে দিনে চাঁদা উঠতো ৬ লাখ ৩০ হাজার টাকা। প্রতিমাসে মোট চাঁদা ১ কোটি ৮৯ লাখ টাকা। ১২টি স্পটের মধ্যে পুলিশ চাঁদাবাজি করতো ৫টি স্পটে। এই স্পটগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি চাঁদাবাজি হতো বালু নদীর ব্রিজের নিচে। এই স্পটের চাঁদাবাজির নেপথ্যে ছিলো আবুল হাশেম। তিনি ক্ষমতাসীন দলের সদস্য। তার ক্ষমতার উৎস এখানকার এমপি

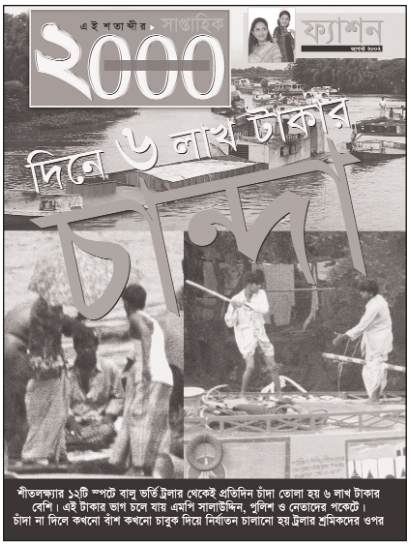

শীতলক্ষ্যার ১২টি স্পটে বালু ভর্তি ট্রলার থেকেই প্রতিদিন চাঁদা তোলা হয় ৬ লাখ টাকার বেশি। এই টাকার ভাগ চলে যায় এমপি সালাউদ্দিন, পুলিশ ও নেতাদের পকেটে। চাঁদা না দিলে কখনো বাঁশ কখনো চাবুক দিয়ে নির্যাতন চালানো হয় ট্রলার শ্রমিকদের ওপর

সালাউদ্দীন। প্রতিবেদনে নেয়া সাক্ষাৎকারে সালাউদ্দিন ২০০০কে বলেছিলেন, 'অবশ্যই আমি এই চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব।' কিন্তু ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি তাকে। কারণ চাঁদার বড় অংশটি তার অ্যাকাউন্টে চলে যেত।

এই মাসের শেষের দিকে সাইটগুলো আবার চালু হবার সম্ভাবনা রয়েছে। বালু নদীর ব্রিজের নিচ দিয়ে আবার চলাচল শুরু করবে ট্রলার। চাঁদাবাজরা হবে সক্রিয়। নীরব দর্শকের ভূমিকায় পুলিশ অভিনয় করে পাবে তাদের অংশ।

নতুন ধান্দা চ্যারেটি কনসার্ট

৮ জানুয়ারি, প্রেসক্লাবের সামনে একটি ঘটনা প্রশ্নবিদ্ধ করেছে চ্যারেটি কনসার্টকে। 'আমার চিকিৎসার দরকার নেই, আমার বাবাকে বাঁচান'- লেখা কাগজ বুকে নিয়ে শাবানা দাঁড়ায় প্রেসক্লাবের সামনে। কেন শাবনাকে এ প্লেকার্ড বুকে নিয়ে রাস্তায় দাঁড়াতে হয়েছিল? এ ঘটনা অনুসন্ধান করে সাপ্তাহিক ২০০০ বর্ষ ৫ সংখ্যা ৩৬ এ একটি প্রতিবেদন করে 'নতুন ধান্দা চ্যারেটি কনসার্ট' নামে। সামনে তুলে

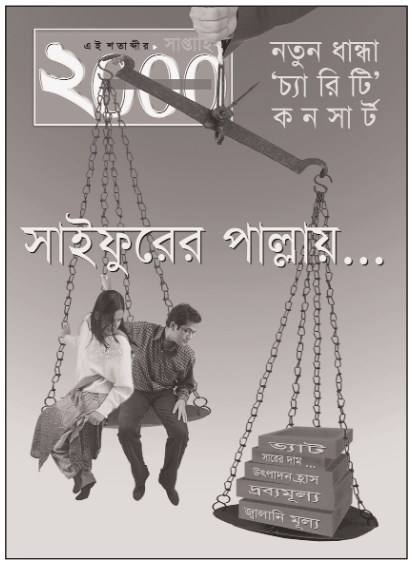

আনে বর্তমানে হওয়া চ্যারেটি কনসার্টের নামে নতুন ধান্দাকে।

ফেজেস নামে একটি নব্য সংগঠন শাবানার চিকিৎসার খরচ বহন করার দায়িত্ব নেয়। অসুস্থ শাবানার একটি ভাল্ব ছিদ্র। চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন ২ লাখ টাকা। ফেজেস শাবানার বাবা শরবত গাজীকে বলে, শাবানার নামে কনসার্ট আয়োজন করে আমরা শাবানার চিকিৎসা করাবো।

শরবত গাজী রাজি হন এ প্রস্তাবে। শাবানার নামে পোস্টার ছাপা হয়। কনসার্ট হয় কিন্তু শাবানার উপস্থিতি কোথাও ছিল না। কনসার্ট শেষে ফেজেস বলে, তারা লসে আছে। আসলে আমাদের দেশের কনসার্টের উদ্যোক্তারা কনসার্ট শেষে এ কথাটিই বলে থাকেন। ফেজেসও নিয়েছিল সে পন্থা। ফেজেসের মূল লক্ষ্য ছিল ব্যবসা। শাবানার নামে চ্যারেটি কনসার্ট করে তারা হতে চেয়েছে লাভবান। শাবানার চিকিৎসার কথা বলে তারা নিয়েছিল সুবিধা। কনসার্ট শেষে শাবানার বাবা তাদের সঙ্গে যোগাযোগের অনেক চেষ্টা করেন। পত্রিকাগুলোতে আবার রিপোর্ট হয়। অবশেষে ফেজেস ২ লাখ টাকার কথা বলে দেয় ৫০ হাজার টাকা। কনসার্টের থেকে লাভ হওয়া বাকি টাকা তারা হাতিয়ে নেয়।

সাপ্তাহিক ২০০০ এই ফলোআপ প্রতিবেদনের জন্য খোঁজ করে শাবানার বাবাকে। ধানমন্ডির রেস্টুরেন্টে তাকে পাওয়া যায়নি। তার চাকরি চলে গেছে। জানা যায়, পুলিশের মাধ্যমে ফেজেস শাবানার বাবাকে হুমকি দেয় যাতে পত্রিকার সঙ্গে কথা না বলে। রেস্টুরেন্টের মালিকের সঙ্গে কথা বলে তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে। এ কোন মানবতা?

চ্যারেটি কনসার্টের নামে ফেজেস ধান্দা করতে চেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তারা করেছেও তাই। এই রিপোর্টের পরে আরো কয়েকটি কনসার্ট হয় আর্মি স্টেডিয়াম ও অন্যান্য স্থানে। ফেজেসের মতো 'ইউ' নামে আরেকটি নতুন সংগঠনের আবির্ভাব ঘটে। ২০ ফেব্রুয়ারি আর্মি স্টেডিয়ামে তারা আয়োজন করে কনসার্টের। লোক সমাগম ভালোই হয়েছিল। লাভ-লসের হিসাব কেউ জানেনি, জানায়নি। অন্তর শো-বিজের আদনান সামীর কনসার্ট শেষ পর্যন্ত বাতিল হয়। টিকিটের টাকা ফেরত দেয়া নিয়ে টালবাহানা করার কথা শোনা যায়।

আমাদের দেশে কনসার্ট হচ্ছে, হবে। তবে তার জন্য প্রয়োজন নিয়ন্ত্রণের। যাতে কোনো প্রশ্ন না ওঠে। তারুণ্যকে আন্দোলিত করার এ কনসার্টের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্যই এটা প্রয়োজন। তা না হলে নতুন নতুন সংগঠন ধান্দাবাজ করে কনসার্টকে, ব্যান্ডসঙ্গীতকে করবে প্রশ্নবিদ্ধ।

গ্যাসরপ্তানি বিতর্ক
সরকার আপাতত ভাবছে না

সাইফুল হাসান

তেল-গ্যাস ইস্যুটি বেশ কিছুদিন ধরে চাপা পড়ে আছে। সর্বশেষ ডিসেম্বর/জানুয়ারির দিকে গ্যাস রপ্তানির ইস্যু নিয়ে উত্তপ্ত আলোচনা চলছিল। তারপর থেকে বিশ্ব পরিস্থিতি ভিন্নদিকে মোড় নেয়ায় আলোচনাটি চাপা পড়ে। তাই বলে বিষয়টি নিয়ে সরকারের ওপর মহল-বিদেশী ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানগুলো চুপচাপ বসে ছিলো, ব্যাপারটি তাও নয়।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই জাতীয় সম্পদ তেল-গ্যাস রপ্তানির জন্য উঠে পড়ে লাগে। সরকারের মন্ত্রীরা বক্তৃতা-বিবৃতিতে গ্যাস রপ্তানির পক্ষে মতামতও রাখেন। অর্থাৎ বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে গ্যাস প্রশ্নে উত্তপ্ত বিতর্ক চলতে থাকে। দেশের অধিকাংশ মানুষ গ্যাস রপ্তানির বিপক্ষে অবস্থান নেয়। এ নিয়ে মিছিল মিটিং সমাবেশও হয় প্রচুর। দেশের বিরোধী দল গ্যাস রপ্তানি প্রশ্নে চুপচাপ থাকলেও আওয়ামী লীগের অবস্থান বিপক্ষে ছিলো বলেই অনেকে মনে করেন। যদিও কারণটা যতটা না আদর্শিক, তারচেয়ে বেশি রাজনৈতিক।

বিতর্কের এক পর্যায়ে জ্বালানি মন্ত্রণালয় গ্যাস প্রশ্নে দুটো জাতীয় কমিটি গঠন করে। কমিটিতে দেশের বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই বিশেষজ্ঞরা আবার রপ্তানি প্রশ্নে দুইভাগে বিভক্ত ছিলেন। আদর্শিকভাবে যখন কেউ একটি পক্ষ অবলম্বন করে, তখন তার কাছ থেকে কতটা নিরপেক্ষতা আশা করা যায়? এই অবস্থার মধ্যেও কমিটি দুটো অনেক সময় ব্যয় করে সরকারের কাছে রিপোর্ট প্রণয়ন করে। সরকারের এই উদ্যোগ প্রশংসিত হয়। জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী এই রিপোর্টের ভিত্তিতেই রপ্তানি বিষয়ক সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা জানিয়েছিলেন সাপ্তাহিক ২০০০কে। মাস চারেক আগে রিপোর্ট দুটি সংসদের ক্যাবিনেটে জমা দেয়া হয়। সংসদীয় কমিটি এখন পর্যন্ত রিপোর্ট দুটি নিয়ে কোনো সভা করেনি বলে জানা গেছে।

গ্যাস রপ্তানির বিষয়টি কোন পর্যায়ে? এ বিষয়ে জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তাকে ফোন করা হয়েছিলো। ফোনে তিনি সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'গ্যাস আমাদের দিতে হবেই। আমরা না চাইলেও। এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। তবে ক্যাবিনেটে গ্যাস রপ্তানির প্রস্তাব জমা আছে। ইরাক ইস্যু নিয়ে সারা বিশ্বের মত বাংলাদেশও এক সংকটাপন্ন অবস্থায় ছিলো। এই অবস্থায় সরকার গ্যাস রপ্তানির মতো উত্তপ্ত ইস্যুকে সামনে আনতে চায়নি। অন্যদিকে জাতীয়

কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়া কতটা সম্ভব হবে সেটাও প্রশ্ন। কারণ মূল ব্যাপার বা সিদ্ধান্ত তো রাজনৈতিক। এখানে সরকারের ইচ্ছাই মুখ্য'। সাপ্তাহিক ২০০০ বর্ষ ৫ সংখ্যা ৩৪-এ 'এক্স ফাইল : গ্যাস রপ্তানি বিতর্ক' শীর্ষক একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করে। জাতীয় কমিটির রিপোর্ট দুটির ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত হবে কিনা সে বিষয়ে দিক নির্দেশনা দেয়া হয়। সে সময় কমিটি বিশেষজ্ঞরাই ২০০০-এর কাছে মতামত দেন, রিপোর্ট দুটি ত্রুটিপূর্ণ। এর ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া ঠিক হবে না। সর্বশেষ খবর অনুযায়ী সরকার এই দুই রিপোর্টের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে।

চলমান সংসদে গ্যাস রপ্তানি বিষয়টি উঠছে কি-না? প্রশ্ন করা হয়েছিলো জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তাকে। উত্তরে তিনি জানান, 'না। কোনো সম্ভাবনা নেই। আপাতত বিষয়টি চাপা পড়ে আছে। পরবর্তী অধিবেশনেও উঠবে কি-না সন্দেহ।'

এদিকে ইউনোক্যাল বাংলাদেশ থেকে ব্যবসা গুটাচ্ছে বলে পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়েছে। অনুসন্ধানে জানা গেছে, সরকার তাদের হ্যাঁ বা না কোনো সিদ্ধান্ত দিতে গড়িমসি করছে বলে তারা হতাশ। ইউনোক্যালের হতাশার মূল কারণ রপ্তানি বিষয়ে সরকারের চুপচাপ থাকা অন্য কিছু নয়। এভাবে সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করছে ইউনোক্যাল। গ্যাস রপ্তানি ও ইউনোক্যাল সংক্রান্ত বিষয়ে জানার জন্য অফিসে ফোন করা হয়। ইউনোক্যালের মুখপাত্র নাসের আহমেদ অফিসের বাইরে আছেন বলে তাদের কোনো মন্তব্য জানা সম্ভব হয়নি। একই বিষয়ে জানার জন্য জ্বালানি প্রতিমন্ত্রীর দপ্তরে যোগাযোগ করলে জানানো হয় তিনি গ্যাস প্রসেসিং পলিসি'র সাব কমিটির মিটিং-এ আছেন।

দেশের অধিকাংশ মানুষের মতামতের বিপক্ষে সরকার গ্যাস রপ্তানির সিদ্ধান্ত নেবে কিনা এটাই ছিলো দেখার বিষয়। কিন্তু সরকার জ্বালানি ক্ষেত্রে খুবই সতর্কতার সঙ্গে এগুচ্ছে। আমেরিকা, বিশ্বব্যাংক, এডিবি, আইএমএফের চাপ তো রয়েছেই, পাশাপাশি অভ্যন্তরীণভাবে তেল কোম্পানির চাপও কম নয়।

গরীব দেশের ওপর ধনী রাষ্ট্র, দাতাদের চাপ থাকবেই। তারপর জনগণের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোই গণতান্ত্রিক সরকারের প্রকৃত কাজ। বর্তমান সরকারও গ্যাস রপ্তানি প্রশ্নে জনমতকে প্রাধান্য দেবে বলে দেশবাসী আশা করে। ইরাক ইস্যুর কারণে বিষয়টি চাপা পড়েছে বলেছে জনগণ ভুলে গেছে ব্যাপারটি তা নয়। জাতীয় গ্যাস কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত হবে না। পাশাপাশি কোনো সিদ্ধান্ত না দিয়ে বিষয়টিকে ঝুলিয়ে রাখার কোনো মানে হয় না। অনুসন্ধানে জানা গেছে, আপাতত সরকার গ্যাস বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তে যাচ্ছে না। তবে ভবিষ্যতে সময় বুঝে বিষয়টি সংসদে আনা হবে।

এদিকে বাংলাদেশের গ্যাস রপ্তানি হলে, হবে ভারতে। কিছুদিন আগে সাপ্তাহিক ২০০০-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন তারা বাংলাদেশের গ্যাসের জন্য অপেক্ষা করছে না। কিন্তু কয়েকদিন আগে ঢাকায় ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী আইকে গুজরাল বলেছেন, দেশের অর্থনীতির স্বার্থে গ্যাস রপ্তানি করা উচিত। গুজরালের কথায় প্রমাণ হয় বাংলাদেশের গ্যাসের জন্য ভারতের আকাঙ্ক্ষা আছে। এজন্য তারা অপেক্ষাও করছে। এক্ষেত্রে সরকারকে সাবধানী হতে হবে। কারণ গ্যাস যেমন রাষ্ট্রীয় সম্পদ, আর এর মালিক জনগণ। তেমনি সরকারও জনগণের। অতএব জনগণের সম্পদের ব্যবহার জনগণের সিদ্ধান্তেই নিতে হবে।

ক্রেতা সাবধান!
নকল পণ্য উৎপাদন অব্যাহত

ক্রেতা সবসময় প্রতারিত হবার সম্ভাবনার মধ্যে থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই ক্রেতাদের একটি বড় অংশ প্রতারণার শিকার হয়। বাংলাদেশের মানুষের জাতীয় জীবনের সব ক্ষেত্রেই এটা বাস্তবতা। পান থেকে শুরু করে বাড়ি-গাড়ি কেনা পর্যন্ত ক্রেতাকে প্রতারণার আতঙ্কের মাঝে থাকতে হয়। দেশে একটি ক্রেতা অধিকার আইন আছে। সেটির কোনো বাস্তবায়ন নেই। নেই কোনো মনিটরিংয়ের

ব্যবস্থা। আর 'জবাবদিহিতা' শব্দটি সম্ভবত বাংলাদেশের প্রশাসনের অভিধান থেকে উঠেই গেছে।

ক্রেতা সবচেয়ে বেশি প্রতারিত হন কসমেটিকস পণ্য কেনার ক্ষেত্রে। এ বিষয়ে সাপ্তাহিক ২০০০ ২৪ জানুয়ারি বর্ষ ৫, সংখ্যা ৩৭-এ একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ঐ প্রতিবেদনে দেখানো হয় কিভাবে ব্রান্ডেড পণ্য নকল হয়, কোথায় তৈরি হয়, বিক্রি হয়, কারা এসবের সঙ্গে জড়িত। রিপোর্ট প্রকাশের পর চার মাস অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু নকল পণ্য বাজার থেকে উঠে যায়নি কিংবা নকল পণ্য প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সরকারি কোনো উদ্যোগও লক্ষ্য করা যায়নি। এমনকি চকবাজার এলাকায় নকল প্রসাধনী বিক্রি হওয়া মার্কেটগুলোতে একটি পুলিশি অভিযান পর্যন্ত হয়নি।

উৎপাদনকারীরা এখনও বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর পণ্যই নকল করছে। জনসন এন্ড জনসন, লিভার, লরিয়েল, মেব্লাইনের মতো কোম্পানিগুলোর পণ্য নকল হয় সবচেয়ে বেশি। নকলকারীরা সবচেয়ে বেশি নকল করে শ্যাম্পু ও বডি স্প্রে। এর বাইরে শেভিং ফোম, নেইল পলিশ, লিপস্টিক, ক্রিম, কোনো কোনো সাবান পর্যন্ত নকল হচ্ছে। চকবাজার, খান মার্কেট, মৌলভীবাজার ও ফেন্সীবাজার এখন পর্যন্ত নকল পণ্যের উৎস। খান মার্কেটে গেলে এখন দেখা যায় ২ তলা জুড়ে বিভিন্ন পণ্যের ওপর স্টিকার লাগানোর কাজ চলছে। অথচ পুলিশ বলছে তাদের এ ধরনের ঘটনা জানা নেই। এ বিষয়ে লালবাগ থানায় যোগাযোগ করলে এএসআই সোহেল সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'এ ধরনের ঘটনা আমাদের জানা নেই। আমাদের কাছে এ সংক্রান্ত কোনো তথ্যও নেই। যদি কেউ অভিযোগ করে আমরা তদন্ত করে দেখবো। আপনারা পত্রিকায় লেখেন, আমরা অ্যাকশন নেবো।' এর আগেও রিপোর্ট প্রকাশের আগে লালবাগ থানার সেকেন্ড অফিসার নূর হোসেন সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেছিলেন, 'রিপোর্ট প্রকাশিত হলে আমাদের জন্য সুবিধা দোষী ব্যক্তিদের খুঁজে বের করতেও সমস্যা হবে না।' নিজেদের অনভিজ্ঞতার কথাও তারা বলেছিলেন। কিন্তু পুলিশ যে কোনো কাজ করে না তার প্রমাণ এ ক্ষেত্রেই মেলে। প্রথম যখন সাপ্তাহিক ২০০০ এ বিষয়ে অনুসন্ধান করার জন্য চকবাজার এলাকায় গিয়েছিলো, তখন ব্যবসায়ীদের কেউ কেউ পুলিশকে টাকা দিয়ে ব্যবসা করার কথা স্বীকার করেছিলো। বাস্তবতাও তাই। কোথাও অবৈধভাবে অর্থ উপার্জনের সুযোগ রয়েছে আর পুলিশ জানবে না এ কথা বাংলাদেশের কেউ বিশ্বাস করে না। প্রথম রিপোর্ট প্রকাশের আগে বিএসটিআইয়েও যোগাযোগ করা হয়েছিল। তখন বিএসটিআই-এর পরিচালক সিএম লুৎফর রহমান সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেছিলেন, 'পণ্যের গুণগত মান দেখার দায়িত্ব আমাদের। নকল প্রতিরোধের দায়িত্ব পুলিশের।' কসমেটিক্সের কিছু পণ্যকে বাধ্যতামূলক অবস্থার মধ্যে আনার চেষ্টা চলছিল বলে তখন তিনি জানিয়েছিলেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এখানেও কোনো অগ্রগতি হয়নি। এ ব্যাপারে বিএসটিআই ডিজির দপ্তরে যোগাযোগ করলে, সেখান থেকে জানানো হয় ডিজি অসুস্থ, ছুটিতে আছেন। এ বিষয়ে সরকারের কোনো উদ্যোগ আছে বলে জানা যায়নি।

অনিয়ম, ক্রেতা অধিকার শব্দগুলো প্রশাসনের কাছে এখন কাগুজে শব্দ। দেশ নিয়ে তাদের মাথা-ব্যথা নেই। দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকে উৎসাহিত করছে সরকার। দেশী-বিদেশী কোম্পানির পণ্য যখন নকল হচ্ছে, তখন প্রতিরোধ করার দায়িত্ব সরকারের। বাস্তবতা কি বলে? চকবাজার, খান সুপার মার্কেট ঘুরে দেখা গেছে কোনো পরিবর্তন নেই। সকাল থেকে হাজার পাইকারি ক্রেতার ভিড় ঠেলে মার্কেটে ঢোকাই দায়। এসব পাইকারি ক্রেতাদের মাধ্যমে নকল পণ্যগুলো ছড়িয়ে পড়ছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। দেশের সব অভিজাত বিপণি কেন্দ্র থেকে গ্রামের ছোট দোকানেও যাচ্ছে এসব পণ্য। নকল এত সুক্ষ প্রক্রিয়ায় হয় যে ক্রেতার জন্য আসল-নকল চেনাই কষ্ট। তাছাড়া সাবান/শ্যাম্পু জাতীয় পণ্যের ফর্মুলা সহজ হওয়ায় অসৎ ব্যবসায়ীরা উৎপাদনও করছে প্রচুর। এগুলো মানুষের নিত্য ব্যবহার্য পণ্য। তাই বাধ্য হয়েই নকল পণ্যকে আসল ভেবে কিনছে এবং ঠকছে। কিন্তু এর শেষ কোথায়? ক্রেতা অধিকার আইন নিয়ে প্রচুর লিখালেখি হয়েছে, সভা-সেমিনার হয়েছে। সরকারের বড় বড় আমলা মন্ত্রীরা বড় বড় কথা বলেছেন। কিন্তু লাভ কি হয়েছে? লাভ তো হয়ইনি, বরং নকল পণ্য উৎপাদন করে ব্যবসায়ীরা সরকার আর আইনের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন। যেহেতু সরকারি কোনো উদ্যোগ নেই এসব বন্ধে, তাই ক্রেতা সাধারণের সাবধান হওয়া উচিত। বিশেষ করে কসমেটিক্স জাতীয় পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে।

সাথী বোস
চলছে নিরন্তর সংগ্রাম

জয়ন্ত আচার্য

বাঙালি নারীর নিরন্তর বেদনার কাব্যমালার যেন শেষ নেই। প্রেম প্রত্যাহারে এসিড নিক্ষেপ। বখাটে ছেলের হাত থেকে রক্ষার জন্য আত্মহত্যা। ধর্ষণের পর হত্যা। যৌতুকের কারণে নির্যাতন, আজও এ সমাজের স্বাভাবিকতা। সাপ্তাহিক ২০০০-এর ৪ অক্টোবরের সংখ্যায় মেহেরপুরের বোস পরিবারের সন্তান সাথী বোসের জীবন সংগ্রামের বেদনার কাহিনী নিয়ে প্রচ্ছদ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। 'একজন সাথী বোস, একটি মামলা এবং কোটি টাকার সম্পত্তি' প্রচ্ছদ প্রতিবেদনটি দৃষ্টি কাড়ে সুধীজনের। মেহেরপুরের রাজনৈতিক নেতা ও প্রশাসনের কর্মকর্তাদের। এ প্রচ্ছদ কাহিনী প্রকাশের পর সাত মাস অতিবাহিত হয়েছে। অনুসন্ধিৎসু মহল থেকে এখনও প্রায়ই জানতে চাওয়া হয়, কেমন আছেন সাথী বোস।

মেহেরপুরের সাথী বোস। এক ক্রমক্ষয়িষ্ণু জমিদার পরিবারে তার জন্ম। বোস পরিবারে জন্ম নিয়েও তাকে পড়তে হয় আত্মপরিচয়ের সংকটে। বাড়ির আশ্রিতা সন্তানকে বোস পরিবার সন্তানের মর্যাদা দিতে জানায় অস্বীকৃতি। সাথীর জন্ম পরিচয়ের সংকট না কাটতেই মারা যান বাবা মহিতোষ। কাকার মৃত্যুর পর জমিদার বাড়ির উত্তরসূরি বাবুরা সাথী বোস ও তার মাকে পশ্চিমবঙ্গে রেখে আসে। স্থানীয় কয়েকজনের সহযোগিতায় বাণী বোস আবারও কয়েক মাস পর মেহেরপুরে ফিরে আসেন। বাসা নেন টিপুর বাড়ির পাশে। সময়ের প্রবাহে এক সময়

খেলার সাথী টিপু সাথীর বন্ধু হয়ে ওঠে। '৭৫ সালে টিপুর সহযোগিতায় বাণী বোস আদালত থেকে বোস বাড়ির সম্পত্তির অধিকার পান। সাথীকে বাণী বোস বিয়ে দেন টিপুর সাথে।

বিয়ের পর আইন পেশায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন সাথী। জন্ম নেয় তার দুটো সন্তান। ধর্ম, বংশ, সম্পত্তি, সামাজিক টানপোড়নে চলতে থাকে তার জীবন। বাণী বোসের কোটি টাকার সম্পত্তি দখলে মরিয়া হয়ে ওঠে নানা মহল। '৯৫ সালের ২৫ মে বোস বাড়ির নিচতলায় নির্জন একটি কামরা থেকে উদ্ধার করা হয় টিপুর লাশ। এ মৃত্যুকে কেন্দ্র করে মেহেরপুরের রাজনীতিতে নানা মেরুকরণ চলতে থাকে। মহিলা আওয়ামী লীগের সভানেত্রী হওয়ায় এ মামলা থেকে ফায়দা লুটতে চায় বিরোধীরা। সাম্প্রদায়িক শক্তি হিন্দু মেয়ের মুসলমান ছেলেকে মেরে ফেলার জিকির তোলে। সাথী ও তার মাকে আসামি করে থানায় মামলা হয়, গ্রেপ্তার করা হয় তাদের। পরে হাইকোর্টের নির্দেশে তাদের জামিন মঞ্জুর করা হয়। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজনীতির স্বার্থে মামলাটি পুনর্জীবিত করা হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট তাদের গত বছর ২৫ আগস্ট আদালতে উপস্থিত হবার সমন জারি করে। ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট এদিন তাদের উচ্চ আদালতের জামিনের নির্দেশ উপেক্ষা করে জেল হাজতে পাঠিয়ে দেয়। পরে জজকোর্ট থেকে জামিন পান। সরেজমিন মেহেরপুরে অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেছে, টিপুর রহস্যঘেরা মৃত্যুর পেছনে রয়েছে কোটি টাকার সম্পত্তি। ২০০০-এ রিপোর্ট প্রকাশের পর কিছু মহল থমকে গেলেও এখন আবার সক্রিয় হয়ে উঠছে। ২০০০কে সাথী বলেন, 'আমাকে প্রতি মাসেই আদালতে হাজিরা দিতে হচ্ছে। হাইকোর্টে মিথ্যা মামলাটি খারিজ করার জন্য আবেদন করা হয়েছে। মামলাটি শুনানির জন্য উঠছে না। সাথী বোস বলেন, 'আমি এখন পরিত্রাণ চাই। একজন সাধারণ নারীর মতো বেঁচে থাকতে চাই।' সাথীর বৃদ্ধা মা বাণী বোসের প্রাণপ্রদীপ বার্ধক্যের কারণে ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে। প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, আসামির অপরাধ নিয়েই কি তার মৃত্যু হবে? মামলার মানসিক যন্ত্রণার কারণে সাথীর দুই ছেলের পড়ালেখা হচ্ছে বিঘ্নিত। পুরো পরিবারটি এখনও অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটাচ্ছে। জানা গেছে, টিপুর পরিবার এখনও মরিয়া মামলা চালিয়ে যেতে।

সাপ্তাহিক ২০০০-এ প্রচ্ছদ প্রতিবেদন প্রকাশের পর সাথীকে অনেকেই সহমর্মিতা জানিয়েছে। কিন্তু সাহায্যের জন্য এগিয়ে যায়নি কোনো মানবাধিকার সংগঠন, নারী নেত্রী। একাই সংগ্রাম করে চলছেন সাথী বোস। হাইকোর্টে শুনানি হচ্ছে না। নিম্ন আদালতে সাথী হাজিরা দিয়েই চলেছেন। সচেতন বিবেকের প্রশ্ন, বাংলা উপন্যাসের নায়িকাদের মতো দায়হীন সমাজের কাছে সাথী কি হেরেই যাবেন? নাকি একবিংশ শতাব্দীর মানবতার দাবিদার সমাজ এগিয়ে যাবে তাকে বাঁচাতে?

খাসিয়া পুঞ্জি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ

বৃহত্তর সিলেটের খাসিয়া পুঞ্জিতে এখনও চলছে উচ্ছেদ আতঙ্ক। পাহাড় থেকে তাদের উচ্ছেদ করতে মরিয়া আজ সর্বমহল। গত বছর মে মাসে সরেজমিনে সাপ্তাহিক ২০০০-এ খাসিয়াদের ওপর প্রচ্ছদ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। একই সঙ্গে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয় সচিত্র প্রতিবেদন। খাসিয়াদের উচ্ছেদের চেষ্টার কাহিনী প্রকাশের পর টনক নড়ে রাজনৈতিক মহলের। প্রশাসনের। তবে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, খাসিয়া পুঞ্জিতে উচ্ছেদ আতঙ্ক এখনও বিরাজ করছে। সম্প্রতি বালাইলামা পুঞ্জিতে আক্রমণ হয়েছে। তবে পাহাড়ের সন্তান খাসিয়ারা উচ্ছেদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হচ্ছে। পুঞ্জি প্রধানেরা নিজেরা সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হতে যাচ্ছেন।

খাসিয়ারা পাহাড়ের আদি সন্তান। ১৯০১ সালে পরিচালিত আদমশুমারি অনুসারে সিলেটে খাসিয়াদের সংখ্যা ছিল ৪০৯১। '৪৭-এর দেশ বিভক্তির পর সিলেটের পার্বত্য অঞ্চল যুক্ত হয় পূর্ব পাকিস্তানের অংশ হিসেবে। তখন থেকে শুরু হয় টানাপড়েন। '৫৬ সালে পূর্ব জরিপে খাসিয়াদের বসবাসরত দুর্গম পাহাড় অঞ্চলকে তাদের দখলিস্বত্ব দেয়া হয়। অথচ নিয়মানুসারে তারাই ছিল ভূমির প্রকৃত মালিক। এরশাদ আমলে খাসিয়াদের জমি একসনা বন্দোবস্ত দেয়ার প্রথা চালু হয়। তখন থেকে উচ্ছেদ প্রক্রিয়া তীব্র হয়।

'৯৭ সালের ৬ জুন মাগুরছড়া পুঞ্জির পাশে গ্যাস ফিল্ডে আগুন লাগে। মাগুরছড়া পুঞ্জিতে এখনও তার প্রভাব রয়েছে। পুঞ্জির লোকেরা মাটির কারণে পানের বরজ, লেবুর বাগান করতে পারছে না। অক্সিডেন্টালের কাছ থেকে তারা কিছু আর্থিক সাহায্য পেয়েছে। জানা গেছে, দাবিকৃত বাকি আর্থিক সাহায্য অক্সিডেন্টাল তাদের এখনও দেয়নি। সম্প্রতি মাগুরছড়া পুঞ্জির খাসিয়াদের সঙ্গে তারা যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছে। বৈরাগী পুঞ্জিতে খাসিয়ারা ক্রমেই সংখ্যালঘু হয়ে পড়ছে। বালাইলামা পুঞ্জিতে সন্ত্রাসীরা প্রায়ই দখলের জন্য চেষ্টা করছে। সম্প্রতি এ পুঞ্জিতে তারা আক্রমণ করেছে। তবে মাধবকুন্ড পুঞ্জিতে এখন বেশ স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে বলে জানা গেছে। সন্ত্রাসীদের দখলে চলে যাওয়া বেলুয়া পুঞ্জি এখনও খাসিয়ারা উদ্ধার করতে পারেনি। তবে পাহাড় হারা খাসিয়া পরিবারগুলো এ পুঞ্জি দখলের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। লুতিঝুড়ি পুঞ্জিতেও এখনও উচ্ছেদ আতঙ্ক বিরাজ করছে। মৌলভীবাজার চা বাগানের কন্দ পরিবারটির ওপর নির্যাতন অব্যাহত রয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ২০০০-এ প্রতিবেদন প্রকাশের পর পরিবারের ওপর নির্যাতন বেড়ে যায়।

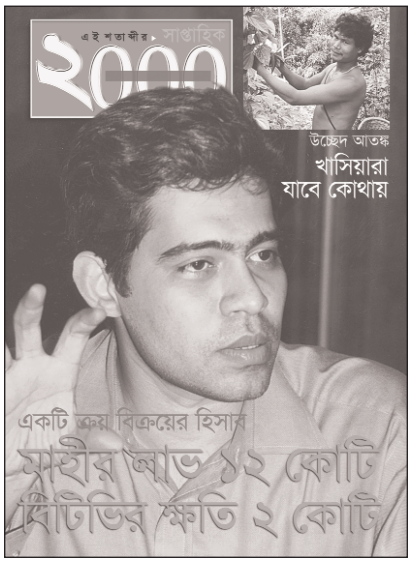

সন্ত্রাসীরা মরিয়া হয়ে ওঠে। গত ১১ মাসে এ পরিবারটির সদস্যদের বিরুদ্ধে ১৫টি মিথ্যা মামলা দেয়া হয়েছে। নিরীহ এ পরিবারটির বিরুদ্ধে নারী নির্যাতন, গাছ চুরি, সন্ত্রাসীদের মামলা থানা গ্রহণ করেছে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে পরিবারের সদস্যদের। গত ৮ মে আদালতের রায়ে এ পরিবারের কয়েকজন জামিনে মুক্তি পেয়েছে।

খাসিয়া পুঞ্জির কয়েকজন হেডম্যানের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা গেছে, সেনাবাহিনীর ক্লিন হার্ট অপারেশনের সময় খাসিয়া পুঞ্জি দখলের চেষ্টা হয়নি। পরিস্থিতি তখন শান্ত ছিল। সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের পর সন্ত্রাসীরা আবার ফিরে আসছে। চাঁদার দাবি করছে। উচ্ছেদের ভয় দেখাচ্ছে।

গত এক বছর বন অধিদপ্তরের খাসিয়াদের ওপর বন মামলা দেয়ার প্রবণতা বেড়েছে। থানায় মিথ্যা জেনেও নেয়া হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের মামলা। তবে চার্চের সহযোগিতায় খাসিয়ারা সংগঠিত হচ্ছে। উচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলছে। বৃহত্তর সিলেটের সব আদিবাসী ঐক্যবদ্ধ হতে যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সংগঠনের সঙ্গেও তারা যোগাযোগ রক্ষা করছে। সম্মিলিতভাবে খাসিয়ারা সরকারের কাছে দাবি করছে আদিবাসীদের জন্য সুনির্দিষ্ট ভূমির নীতিমালা প্রণয়নের। প্রণীত নীতিমালার মাধ্যমে তারা পাহাড়ের প্রকৃত স্বত্বাধিকারী হতে পারবে। প্রশাসন ও সন্ত্রাসীদের অবাঞ্ছিত আতঙ্ক থাকবে না। তারা পারবে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে।

৫৭০ কোটি টাকা লুটপাট এবং ঢাকা সিটি কর্পোরেশন

বদরুল আলম নাবিল

দুর্নীতিপরায়ণ দেশ হিসেবে বাংলাদেশের সুনাম আছে বিশ্বব্যাপী। আর দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে সম্প্রতি ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সুনাম (!) হয়েছে দেশব্যাপী। ডিসিসিতে দুর্নীতি নিয়ে বিভিন্ন সময়ে দেশের সংবাদপত্রগুলোতে রিপোর্ট হয়েছে। তবে সেসব রিপোর্টের মধ্যে কিছু রিপোর্ট যেমন তথ্যনির্ভর, তেমন কিছু ছিলো মন্তব্যধর্মী। এসব রিপোর্টের অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুর্নীতির জন্য দায়ী কর্মকর্তা বা কর্মচারীর নাম অথবা পরিচয় দেয়া হয়নি। বর্তমান মেয়র সাদেক হোসেন খোকা দায়িত্ব নেয়ার কিছু দিন পরই ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০২ সাপ্তাহিক ২০০০-এ প্রচ্ছদ কাহিনী প্রকাশিত হয় প্রতিষ্ঠানটির ৫৭০ কোটি টাকা লুটপাট নিয়ে। রিপোর্টটি ব্যাপক আলোড়ন তৈরি করে। এতে ১২-১৩টি বড় বড় প্রকল্প কিভাবে লুটপাটের জন্য তৈরি করা হয়েছিলো, কিভাবে লুটপাট হয়েছিলো এবং এই অর্থ আত্মসাৎ কারা কিভাবে করেছিলো, তাদের নাম, পদবি, এমনকি ছবিও ছাপা হয়েছিলো।

যেসব দুর্নীতির কথা লেখা হয়েছিলো

সাপ্তাহিক ২০০০-এর ঐ রিপোর্টটিতে ছিলো ডিসিসির সাবেক ভারপ্রাপ্ত প্রধান প্রকৌশলী সামসুল হক ভূঁয়ার জালিয়াতি এবং শত শত কোটি টাকা আত্মসাতের কাহিনী। তিনি কিভাবে অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প তৈরি করে, টেন্ডার জালিয়াতি করে নিজের লোকদের কাজ পাইয়ে দিয়েছেন, কোনো কাজ না করিয়েই আবার তাদের বিল দিয়ে দিয়েছেন। যেমন তার ভাগ্নে নূরুর রহমান ভূঁইয়াকে দিয়েছিলেন ৯ কোটি ৪০ লাখ টাকার রোড মার্কিং-এর কাজ। ১ কোটি টাকারও কাজ না করে পুরো টাকা তুলে নিয়েছিলেন নূরুর রহমান।

দরপত্র সংবাদপত্রে না ছাপিয়ে, দরপত্র ছাপানো হয়েছে কাগজপত্রে দেখিয়ে নিজের লোকদের কোটি কোটি টাকার কাজ দিয়ে দেয়ার ঘটনাও ঘটেছে কয়েকবার। প্রকল্পের কাজ পাওয়ার পর কোনো রকম কাজ না করেই কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়ার ঘটনা ঘটেছে বেশ কয়েকবার। আবার একটি প্রকল্প থেকে কোনো একটি রাস্তা সংস্কার করা হয়েছে তার ওপরে ঐ রাস্তায় আবারও সংস্কার প্রকল্প তৈরি করে কোনো কাজ না করে টাকা হাতিয়ে নিয়েছে কয়েকটি ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান।

বিশ্বব্যাংকের অর্থ সাহায্য পরিচালিত ঢাকা আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্টের অধীনে নগরীর বেশ কিছু রাস্তা সংস্কার করা হয়েছে। ডিটিপি প্রকল্পের অধীনে যেসব রাস্তার সংস্কার কাজ চলছিলো বন্যা পুনর্বাসন প্রকল্পের নাম করে, সেসব রাস্তা সংস্কারের জন্য আরেকটি টেন্ডার করা হয়। কোনো টেন্ডার আহ্বান ছাড়াই ২২ কোটি ৩৩ লাখ টাকার কাজটি পেয়ে যায় ডিসিসির শীর্ষ ঠিকাদার হারুনুর রশিদের নাজমা কনস্ট্রাকশন। এরপর অন্তত ১০টি রাস্তায় কোনো কাজ না করেই যোগসাজশের মাধ্যমে বিল তুলে নেন ঠিকাদার।

যান্ত্রিক বিভাগ লুটপাটের আখড়া

ডিসিসির ১৩টি বিভাগের মধ্যে সবচেয়ে বেশি লোপাটের ঘটনা ঘটেছে যান্ত্রিক বিভাগে। এখানে লুটপাটের সুযোগও বেশি কারণ, প্রতিবছর সিটি কর্পোরেশনের সবচেয়ে বেশি খরচ হয় বিভিন্ন বিভাগের যন্ত্রপাতি এবং গাড়ি, ট্রাক কেনাকাটা এবং রাস্তা সংস্কারের জন্য। এ দুটো কাজই হয় এ বিভাগ থেকে। ২০০০ সালে বিদ্যুৎ লাইনে কাজ করার জন্য ১৬টি হাইড্রোলিক ল্যাডার কেনা হয় চীন থেকে। ৪ লাখ টাকা দামের প্রতিটি ল্যাডার কেনা হয়েছিলো ১৩ লাখ করে। তারপর বিদ্যুৎ বিভাগ একদিনও এগুলো ব্যবহার করতে পারেনি। কারণ এগুলোর ওপর উঠে কাজ করতে গেলে উল্টে পড়ে যায়। এই ক্রয় থেকে লাভবান হয়েছিলেন তিনজন শীর্ষ প্রকৌশলী। তাদের একজন বরখাস্ত হয়েছেন, বাকি দু'জন স্বপদে বহাল আছেন এবং একইভাবে লোপাট চালিয়ে যাচ্ছেন।

ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা সংস্কার করা হয় অ্যাসফল্ট প্লাট থেকে, যা যান্ত্রিক বিভাগই পরিচালনা করে। প্রতি বছর ১৮-২০ কোটি টাকা খরচ হয় এই খাতে। বিগত দিনে এর বেশির ভাগ কাজ পেয়েছিলো নাজমা কনস্ট্রাকশন এবং যথারীতি যৎসামান্য কাজ করে পুরো টাকা আত্মসাৎ করেছে। এখনো সেসব ঠিকাদারই কাজ পাচ্ছেন, লুটপাট করছেন। শুধু পার্সেন্টেজ যাদের দিতে হয় তাদের দু-একজন পরিবর্তিত হয়েছেন। এ বিভাগে দুর্নীতির আরো বেশ কয়েকটি ঘটনা লেখা হয়েছিলো। যার কোনোটিরই প্রতিকার হয়নি। স্থানীয় সরকারমন্ত্রী একবার গিয়েছিলেন ডিসিসির ওয়ার্কশপ পরিদর্শনে। তার দৃষ্টি এড়ানোর জন্য ২ কোটি ৮ লাখ টাকায় কেনা ব্যবহার অযোগ্য হাইড্রোলিক লেডারগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছিলো। কিন্তু কেন?

বিগত কয়েক বছরে সিটি কর্পোরেশনের কোটি কোটি টাকার সম্পদ বেহাত হয়ে গেছে। দখল করেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা এবং হাউজিং কোম্পানিগুলো। মিরপুরের একটি জমি দখল করে ট্রপিক্যাল হোমস নামের একটি কোম্পানি ১৬৪টি ফ্ল্যাট বিশিষ্ট একটি বিশাল বিল্ডিং তৈরি করে তা বিক্রি শেষ করেছে।

যেসব দুর্নীতির কথা লেখা হয়েছিলো সেসময়, সেগুলো বেশ আলোচিত হয়েছিলো। সাপ্তাহিক ২০০০-এর সেই রিপোর্টের আলোকে বিটিভি'র প্রতিবেদনমূলক অনুষ্ঠান 'আপনার চারপাশ' তাদের একটি পর্ব নির্মাণ করেছিলো। মেয়র ২০০০-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তদন্ত করে দুর্নীতিবাজদের শাস্তি দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। যেসব ঠিকাদারের কথা লেখা হয়েছিলো তাদের বিল কিছু দিন আটকে রেখেছিলেন, এখন অবস্থা আবার ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে আসছে। জানা গেছে, বর্তমান মেয়রের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছেন যাকে ইতিমধ্যেই দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তা এবং ঠিকাদাররা কিনে ফেলতে পেরেছে। তার মাধ্যমেই তারা এখন মেয়রকে কেনার পাঁয়তারা করছে। ঐ আলোচিত বন্ধুর কারণেই নাকি দুর্নীতিপরায়ণরা পার পেয়ে যাচ্ছেন শত শত কোটি টাকা লুটপাট করে।

মশা নিয়ে মশকরা

ঢাকার মশা নিয়ন্ত্রণ না হওয়ার কারণ ডিসিসির স্বাস্থ্য বিভাগের দুর্নীতি। ভেজাল এবং নিম্নমানের ওষুধ ও যন্ত্রপাতি কিনে তারা অর্থ বানাতে ব্যস্ত। স্বাস্থ্য বিভাগের দুর্নীতিপরায়ণরা এখনো আছে নেতৃত্বে। প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. আশ্রাফ উদ্দিন সাবেক মেয়রের সময়ে পরিবেশের ক্ষতি হবে ধুয়া তুলে এরিয়েল স্প্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন কিন্তু এখন তিনিই বর্তমান মেয়রকে পরামর্শ দিচ্ছেন এরিয়েল স্প্রে করতে! কারণ কি?

সাপ্তাহিক ২০০০ ঐ রিপোর্টটি এবং পরবর্তীতে আরো কয়েকবার পরামর্শ দেয়া হয়েছিলো নগরীর মশা নিধন এবং ময়লা পরিষ্কারের কাজ বেসরকারি খাতে ছেড়ে দিতে। সম্প্রতি মেয়র সে সিদ্ধান্তই নিয়েছেন এবং এ লক্ষ্যে দুটি পৃথক দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।

পরিচ্ছন্নতা বিভাগে দুর্নীতি এবং নগর পরিচ্ছন্ন রাখতে ব্যর্থ হওয়ায় প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা শাহ আলম দেওয়ানকে ওএসডি করা হয়েছে সাপ্তাহিক ২০০০-এর রিপোর্টের পরে। কিন্তু শীর্ষ দুর্নীতিবাজরা এখনো বহাল আছেন। যান্ত্রিক বিভাগের এক কর্মকর্তাকে মেয়র লিখিতভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন সাপ্তাহিক ২০০০কে সব রকম তথ্য দিয়ে সহায়তা করতে, কিন্তু দুর্নীতিপরায়ণ সেই কর্মকর্তা তা করেননি। মেয়রের সে নির্দেশ ছাপা হয়েছিলো ২০০০-এ। তারপরও পার পেয়ে গেছেন সেই কর্মকর্তা অদৃশ্য খুঁটির জোরে। এভাবে চলতে থাকলে ডিসিসিতে দুর্নীতি বেড়েই চলবে, কমবে না।